কারাগারে জমজমাট মাদক ব্যবসা

খোন্দকার তানভীর জামিল ও ইমরোজ বিন মশিউর

‘একদিন ঘুম থেকে উঠে শুনলেন, আপনাকে জেলার বানানো হয়েছে। তখন কি করবেন?’ এর উত্তরে তালিকাভুক্ত ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর মধ্যে কারাগারে আটক একজন বলেছে, ‘জেলখানার দুর্নীতি বন্ধের চেষ্টা করবো। এতে হয়তো আমার পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত হবে।’ এই অপরাধীর মতে, কেন্দ্রীয় কারাগারের ৯৯% দুর্নীতির ঘটনা কখনোই জেলের ২৫ ফুট উঁচু দেয়াল টপকে বাইরে প্রকাশ পায় না। বরং দুর্নীতির শিকার হয়ে অনেক সাধারণ অপরাধী জেল থেকে বের হয়ে সন্ত্রাসী হয়ে যায়।

এ শীর্ষ সন্ত্রাসীর সঙ্গে কথা হয়েছিল ঢাকা জজকোর্টে গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে। একটি মামলার হাজিরা দিতে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আনা হয়েছিল। এ সময় তার কাছে কারাগারে আটক বন্দি হাজতি ও কয়েদিদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সে ২০০০কে জানায়, ‘আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না, জেলখানায় কতো মানুষ বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটকে আছে।’ সে আরো জানায়, ‘এদের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। আর একটা মানুষ বিচারের আগেই যদি ৬ মাস কিংবা এক-দুই বছর জেল খাটে, তখন তার মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া আসবেই। যেখানে একটা ছেলের ২ দিন থাকার কথা সেখানে তাকে রাখা হচ্ছে ২ মাস কিংবা ২ বছর। তো ওই ছেলের মধ্যে কষ্ট ঢুকবে না? তাছাড়া জেলখানায় ১০টা প্রকৃত সন্ত্রাসীর সঙ্গে পরিচয় হয়। তাদের কাছ থেকেই শেখে কিভাবে সন্ত্রাস করতে হয়। এরপর এক সময় জেল থেকে বেরিয়ে সেও খারাপ পথে পা বাড়ায়। সন্ত্রাসী হতে চায়।’

তার ভাষায়, ‘আমি মনে করি, জেলখানা হইলো একটা দোজখ। সেই জায়গা থেকে কেউ বাহির হইয়া খারাপ কাজ করতেই পারে না। যদি তারে আপনে খারাপ না বানিয়েছেন জোর কইরা। করলে তো আবার জেলে যাওন লাগবো।’ অথচ এ দেশের জেলখানায় অপরাধীকে সংশোধন তো করা হয়-ই না, বরং সাধারণ বন্দিদেরও খারাপ রাস্তায় পা বাড়াতে উৎসাহিত করা হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আসামি থাকার কথা আড়াই হাজার। অথচ থাকে ১২ হাজার হাজতি আর কয়েদি। যার মধ্যে ৮ হাজারই বিনা বিচারে আটক রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কয়েদি-হাজতিরা কোনো সমস্যা বা কোনো বিষয়ে কারারক্ষীর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেই ঘুষ দিতে হয়। আর বেশির ভাগের পক্ষেই ঘুষের অর্থ জোগানো সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় কেউ কেউ বেছে নেয় জেলের ভেতরে মাদক বেচা-বিক্রির কাজ। ওই সন্ত্রাসীর কাছ থেকে আরো জানা যায়, কারাগারের ভেতর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় হেরোইন, গাঁজা, মাঝে মধ্যে ফেনসিডিল-মদ-বিয়ারও পাওয়া যায়। জেলের মধ্যে হাজতি-কয়েদিদের ৪০ ভাগই হেরোইন আসক্ত। এদের বলা হয় পানতি। ২০ ভাগ খায় গাঁজা। আর যারা এগুলো খায়, তাদের অর্ধেকই জেলে এসে নেশা করতে শিখেছে। একদিন জেল থেকে ছাড়া পেলেও এরা নেশা ছাড়তে পারে না। বিশেষ করে হেরোইনখোররা। তাই জেলের বাইরে গিয়ে তারা সন্ত্রাসী কাজ শুরু করে এবং একদিন ধরাও পড়ে। আবারও জেলে আসতে হয়। আর জেলের ভেতর নেশার টাকা জোগাড় করতে এই মাদকাসক্তরাও মাদক বিক্রিতে নেমে পড়ে। কেন্দ্রীয় জেলখানা এভাবেই হয়ে উঠেছে নেশাখোর আর সন্ত্রাসী তৈরির কারখানা।

মাদক ব্যবসা নিয়ে কারাগারে একাধিক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেছে। সর্বশেষ গত ২২ ও ২৩ মার্চ মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মাদক বিক্রেতাদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও মারামারির ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, কারা অফিসার ও কারারক্ষীদের মদদে জেলে মাদক ব্যবসা করে সুইডেন আসলামের ভাগিনা এমরান M“C ও কাঙালি জাকির গ্রুপ। জেলে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে কারা প্রশাসনের মদদে কাঙালি জাকির গ্রুপ হামলা চালায় সুইডেন আসলাম গ্রুপের ওপর। গত ২২ মার্চ দুপুরে এ মারামারি ঘটে ৩ খাতা ওয়ার্ডের সামনে। এ সময় কর্তব্যরত কারারক্ষী মিয়াসাব (কনস্টেবল) ও জমাদার (হাবিলদার) কাঙালি জাকির গ্রুপের পক্ষ নেয়। অন্যদিকে জেলে প্রতিনিয়ত নানা অজুহাতে বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার সাধারণ হাজতি ও কয়েদিদের একটি ছোট্ট অংশ এমরান গ্রুপের পক্ষ নেয়। তারা দীর্ঘদিনের ক্ষোভ প্রশমন করতে এক কারারক্ষীকে বেধড়ক মারধর করে। মারামারি ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। তাদের হস্তক্ষেপে এবং সাধারণ কয়েদি-হাজতিদের সহযোগিতায় মারামারি বন্ধ হয়। তবে থেমে থেমে ২৩ মার্চ রাত পর্যন্ত বিভিন্ন সেল ও ওয়ার্ডের ভেতরে এবং বাইরে আরো কয়েক দফা সংঘর্ষ হয় বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় আহত ২৭ জনকে কারা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রধান কারারক্ষীসহ ৬ জনকে সাময়িক বরখাস্ত এবং ৯ জনকে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে। আর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, সংঘর্ষ ও মাদক ব্যবসার অভিযোগ তদন্তে গত ২৪ মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিবকে (প্রশাসন) আহ্বায়ক

করে ৮ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে বলা হয়েছে।

এ ঘটনার পরপরই গত ২৫ মার্চ কারাধ্যক্ষ আরিফুজ্জামানসহ ১২ জনের একটি দল কারাগারের ভেতরে মাদকদ্রব্য উদ্ধারের জন্য অভিযান শুরু করে। এতে অভিযোগ পাওয়া গেছে, মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে লোক দেখানো এ অভিযানের সময় দুটি বাথরুম এবং এর আশপাশের এলাকা ঘুরে কারা কর্মকর্তারা চলে যান। মূল মাদকের স্পটগুলোর ধারেকাছেও তারা যাননি। বরং বাইরে এসে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের বলেন, 'তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কারাগারের ভেতরে কোনো মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়নি। পত্রিকাগুলো অতিরঞ্জিত করে লেখার কারণে তাদের বাড়তি কষ্ট করতে হলো।' খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সম্প্রতি র‍্যাব এবং মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাঁড়াশি অভিযানে মাদক পাচার ও বেচা-কেনায় কিছুটা ভাটা পড়েছে। এতে অবশ্য জেলের অভ্যন্তরে রমরমা মাদক ব্যবসায় বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। কিন্তু বিপত্তি বাধে মাদকের দাম বেড়ে যাওয়ায়। মাদক বিক্রির লাভের টাকার ভাগ-বাটোয়ারা বাড়ানো নিয়েই গত ২২ ও ২৩ মার্চ জেলে মারামারি হয়।

কারারক্ষীদের নিয়ন্ত্রণে মাদক ব্যবসা

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, কারাগারে ৬০ ভাগ মাদকের চালান ঢোকে কারারক্ষীদের মাধ্যমে। বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারারক্ষীর সংখ্যা ৭৪৫ জন। প্রতি ৮ ঘণ্টা পরপর ৮৫ জন কারারক্ষীর শিফট বদল হয়। আর এ সময় তাদের মাধ্যমে গাঁজা-হেরোইনসহ বিভিন্ন মাদক জেলে পাচার হয়। জানা গেছে, বাইরে থেকে ১০০ গ্রাম হেরোইন কেনা হয় ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকায়। আর জেলের ভেতর তা বিক্রি হয় ৮০ থেকে ১ লাখ টাকায়। বাইরে স্পটে এক পাতা হেরোইনের মূল্য ৩০ টাকা। আর ভেতরে তা বিক্রি হয় ৫০ থেকে ১০০ টাকায়। কোর্টে হাজিরা দিতে আসা এবং জামিনে মুক্তি পাওয়া একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পণ্য বিনিময় পদ্ধতিতেও জেলে মাদক ব্যবসা চলে। ৫০ টাকার পরিবর্তে ১ প্যাকেট গোল্ডলিফ ও একটি গায়ে মাখার সাবান (বড় সাইজ) অথবা ১ প্যাকেট বেনসন দিয়ে পাওয়া যায় ১ পাতা হেরোইন অথবা এক পুরিয়া গাঁজা। অবশ্য বাইরে এক পুরিয়া গাঁজার দাম মাত্র ১০ টাকা। এ প্রসঙ্গে এক হাজতি বলেছে, 'গাঁজা হইলো নেশার রাজা। কিন্তু ভেতরে (জেলে) গাঞ্জুইট্যা... পোলারা ভুয়া মাল বেঁচে। খাইলে ফিলিংস হয় না। তাই গাঁজা ছাইড়া অনেকেই পাউডার খায়। কারণ দামও এক।

কারাগারের ভেতর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় হেরোইন, গাঁজা, মাঝে-মধ্যে ফেনসিডিল-মদ-বিয়ারও পাওয়া যায়। জেলের মধ্যে হাজতি-কয়েদিদের ৪০ ভাগই হেরোইন আসক্ত

আর এক টানেই ভরপুর ফিলিংসও পাওয়া যায়।'

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, জেলে মাদকের ২৫ ভাগ চালান যায় সেখান থেকে আদালতে হাজিরা দিতে আসা বিভিন্ন মামলার আসামিদের মাধ্যমে। আর ১৫ ভাগ মাদক পাচার হয় জেলে চাল-ডাল প্রভৃতি এবং কারা হাসপাতালের প্রয়োজনীয় মালামাল ঢোকানোর সময়। তবে এ সবই কারারক্ষী ও উর্ধ্বতন কারা কর্মকর্তাদের যোগসাজশেই ঘটে থাকে। আর এই জমজমাট মাদক ব্যবসায় প্রতিদিন এক থেকে দেড় লাখ টাকা হাত বদল হয়। এর ৩০ ভাগ পায় মাদক বিক্রেতারা। কারারক্ষী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে বাকি টাকা ভাগবাটোয়ারা হয়। তবে জেলে মাদক ব্যবসা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে কারারক্ষীদের মধ্যে মিয়াসাব ও জমাদার এবং হাজতি ও কয়েদিদের মধ্যে ম্যাট পাহারাদার ও রাইটাররা।

জানা গেছে, জেলে মাদক বিক্রি এবং সেবনের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হচ্ছে ঝাড়ুদার ও সুইপারদের থাকার স্থানটি। এটি জেলের অভ্যন্তরে এরশাদনগর এবং আমদানি ওয়ার্ডের মাঝখানে অবস্থিত। সাধারণত ধর্ষণ, খুন এবং এসিড নিক্ষেপের মামলায় ৪০ থেকে ৫০ বছরের কারাদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদিরা জেলে ঝাড়ুদার ও সুইপার হিসেবে কাজ করে। জেলের ভেতর সর্বত্র এদের অবাধ যাতায়াত। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা জেলের মধ্যে অবাধে মাদক বিক্রি করে থাকে। বিভিন্ন সেল ও ওয়ার্ডে মাদক পৌঁছানো বাবদ তাদের দিতে হয় এক প্যাকেট বিড়ি অথবা ২-৩টি সিগারেট। তবে অধিকাংশ মাদকসেবী ১০-১৫ টাকা খরচ করে তিন-চারটি গেট পার হয়ে ঝাড়ুদফা বা সুইপারদফায় গিয়ে মাদক সেবন করে। এর বাইরে অন্যখানে মাদক সেবনের সময় কারারক্ষীদের হাতে কেউ ধরা পড়লে তাকে শাস্তি হিসেবে পাঠানো হয় 'কেস ফাইল'-এ। অবশ্য ১০০ থেকে ২০০ টাকা দিলেই শাস্তি মাফ হয়ে যায়। অথচ এ কারারক্ষীদের মদদেই জেলে চলে গাঁজা ও হেরোইন ব্যবসা। গত বছরের শেষের দিকে কারাগারের ২০ নম্বর সেলে ফেনসিডিল ব্যবসাও রমরমা হয়ে ওঠে। এক বোতলের দাম ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। কিন্তু অধিক মূল্যের কারণে তা বেশি দিন টেকেনি। তারপরও এখন দৈনিক কমপক্ষে ৫০ থেকে ১০০ বোতল ফেনসিডিল বিক্রি হয় কারাগারে। আর তা সরাসরি আসে কারারক্ষীদের মাধ্যমে।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কোনো কয়েদি বা হাজতি একা নেশা করে না। কারণ প্রতিদিন কেউ একা ৫০ টাকা নেশা বাবদ খরচ করলে তার ওপর চোখ পড়ে যায় কারা প্রশাসনের। আর তখন তাকে নানা অজুহাতে ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায় করা হয়। নইলে কেস ফাইলে পাঠিয়ে চালানো হয় নির্যাতন। এসব কারণে জেলে মাদকাসক্তরা ২/৪ জন মিলে দলবেঁধে নেশা করে এবং একেক দিন একেকজন মাদকের ব্যয়ভার বহন করে।

শুধু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার নয়, সারা দেশের প্রতিটি কারাগারই এখন মাদক ব্যবসার আখড়ায় পরিণত হয়েছে। কয়েদি ও হাজতির মধ্যে মাদকসেবীদের সংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। এতে জেলের ভেতর বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগের বিস্তারও ঘটেছে মহামারী আকারে। তবে কারা হাসপাতালে এই রোগ নিরাময়ের চিকিৎসা নেই বললেই চলে। বরং কারা হাসপাতালেও চলে অনিয়ম ও দুর্নীতি। প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা দিয়ে সুস্থ হাজতিরা রোগী সেজে কারা হাসপাতালে অবস্থান করে। এর সঙ্গে হাসপাতালের চিকিৎসক এবং জেল প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। একই সঙ্গে হাসপাতালেও চলে মাদক সেবন। ২০০৩ সালে রোজার ঈদে একটি মামলার বিচারাধীন এক আসামি ছিলো কারা হাসপাতালে। সে জানায়, 'ঈদের দিন দুপুরে আমি কারা হাসপাতালে ট্রলিতে করে ৬ বোতল বিদেশী মদ আনতে দেখেছি। পরে শুনেছি মিরপুরের এক শীর্ষ সন্ত্রাসী ওই বিদেশী দামি মদ আনিয়েছিলো।' কারাগারে মাদক ব্যবসা বিষয়ে কথা বলার জন্য একাধিকবার চেষ্টা করেও ভারপ্রাপ্ত জেল সুপারকে পাওয়া যায়নি। অন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও কথা বলতে চাননি।

সর্বশেষ গত ২৭ মার্চ দুপুরে কারাগারের ভেতর গাঁজা পাচার করার সময় মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা দু'জনকে আটক করেছেন। কিন্তু এ রকম তৎপরতা কতোদিন থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তাছাড়া কারা অভ্যন্তরের আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা না নিলে মাদক ব্যবসা ও সেবন চলবেই।

ছবি : **সালাউদ্দিন টিটু**